শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

কাইজার চৌধুরী

তাম্রলিপি

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প
কাইজার চৌধুরী

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৯৬

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
মা প্রিন্টিং প্রেস
১৮/২৩ গোপাল শাহ লেন, ঢাকা

মূল্য : ৩৪০.০০

Srestho Kishoregolpo
By : Kaiser Chowdhury
First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 340.00 $12

ISBN : 978-984-98741-3-3

উৎসর্গ

আমাদের শিশু-সাহিত্যের বরপুত্র প্রিয় আলী-ইমাম।।
তোমার একখানা বই উপহার দিতে গিয়ে লিখেছিলে–

'একসঙ্গে আমাদের পথচলা।'

তারপরেও বন্ধু, আমাকে পথে একলাটি ফেলে তোমাকে চলে যেতে হলো?

শান্তিতে ঘুমোও, প্রিয় বন্ধুটি।।
কাইজার।।

আমার কথা

কোনো গ্রন্থের ভূমিকা লেখা-টেখা আমার ধাতে নেই। গল্প লিখব, প্রকাশক পাকড়াও করে বই প্রকাশের ব্যবস্থা নেব তারপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বইগুলো থেকে গল্প-কয়েক বাছাই করে নতুন এক মলাটে গ্রন্থবন্দি করব-এই কি যথেষ্ট নয়? তাহলে ভূমিকা ব্যাপারটা কাঁধে সওয়ার করিয়ে দেয়া কেন বাপু?... বলা হলো, এটাই নাকি দস্তুর; আরো স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো, অতীতেও নাকি এ ব্যাপারে আমি বিশেষ ভূমিকা রেখেছি। অগত্যা–... গল্পগুলো 'শ্রেষ্ঠ' কী না, সে বিচার আমার নয়। তবে, দশ-কুড়ি কি তারও আগে প্রকাশিত রচনাগুলো আমার যে বেশ প্রিয়, সেকথা স্বীকার যেতে দ্বিধা নেই। যে সকল চরিত্রগুলোর সান্নিধ্যে আমার দিন কাটে—মানে, বিল্টু মামা, ন্যাড়া, পিচ্চি– ওরা তো আছেই, আরো আছে আমার অজানা-অচেনা কিছু মানুষজন, আর আছে অবধারিত নিয়মে— আমাদের একাত্তর। গল্পগুলো দু-তিন যুগ পূর্বের ছেলেপুলেদের কেমন লেগেছিল, জানি না— ওদের তরফ থেকে কোনো অভিযোগ-টভিযোগ আজতক পাইনি, আর তাছাড়া ওরা এখন বড়-টর হয়ে চাকরি-বাকরি করতে আর আপন-আপন ছেলেপুলেদের সামলাতে ব্যস্ত। তবে রচনা-এগারো যদি এ যুগের কিশোর-কিশোরীদের ভালো লাগে তাহলে আমি যে আহ্লাদে আটখানা হব সে কথা দিব্যি বলা যায়।

কাইজার চৌধুরী

একুশে' ২৪

সূচিপত্র

ফ্যাচাঙ ফু-র গল্প	১১
ছাপাখানার ভূত	২২
অভির নানাভাই	৩৬
পাতানো খেলার ইতিবৃত্ত	৪৭
গল্পের ষাঁড়াংশ	৫৮
আবুলের সোয়েটার	৭০
শহরে এক বাঘ এসেছিল	৭৯
মিন্টু-ঘিন্টুর পূর্ব পুরুষের গল্প	৮৮
চোরের গল্প ভুতের গল্প	৯৮
বুড়ির সেই লাল-সবুজ বাড়িটি	১১০
রাজুর নবম বিড়ম্বনা	১২৯

ফ্যাচাঙ ফু-র গল্প

সেকি! ফ্যাচাঙ ফু-র গল্প তোদের বলা হয়নি বুঝি?

বলিসনি বলেই তো মনে হচ্ছে।

কইয়া ফালা। কইয়া ফালা। মনের কথা প্যাটের ভিতর রাখতে নাই।

যথাক্রমে ন্যাড়া, আমি আর পিচ্চি – এ তিন বন্ধুর সংলাপ শুরু হয়েছিল এমন করে।

আমার পড়ার ঘরে ঢুকেই ন্যাড়া বলেছে, কী লিখছিস রে?

গল্প।

তোর বিল্টু মামার কাণ্ড – কারখানা নিয়ে তো?

কেমন করে টের পেলি?

হাহ্! হেইডা আবার জিগান লাগে? বিল্টু মামা ছাড়া তোর আর আছেই বা কেডা? – পিচ্চি বলেছে।

ভাগ্যিস বিল্টু মামা নামে তোর এক মামা ছিল। নইলে তুই কি কোনো গল্প – টল্প লিখতে পারতিস, বল? –ন্যাড়ার যুক্তি।

তোর এই মামার লাইগাই তো আমাগো তিন বন্ধুর মইধ্যে তোর এত নামধাম।– পিচ্চির উক্তি।

খাঁটি কথা। নামধাম আছে– হবে আরও– তবে এক বিল্টু মামার কীর্তি–কাহিনি ছাপিয়ে কত বিখ্যাত হতে পারবি, সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। –ন্যাড়া ওর ন্যাড়া মাথাটাকে নাড়াতে নাড়াতে বলেছে।

আয় হায়! শেষকালে অর্ধেক বিখ্যাত অইয়া আমাগোর মান-ইজ্জত বুড়িগঙ্গায় ভাসাইয়া দিবি?– পিচ্চি আমার ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

সে কথা নয়–তবে ওর অবস্থা হবে আমার বটুক চাচার মতন। এ্যাদ্দিনে আমার বটুক চাচাও বিখ্যাত হয়ে যেত, কিন্তু ফ্যাচাঙ ফু-র জন্যে সব ভেস্তে গেল।

এতক্ষণে আমি সাড়া দিই, ফ্যাচাঙ ফু, ও আবার কে?

তারপরেই সেই সংলাপ যা একটু আগেই বলেছি তোমাদের।

বলব তো বটেই–বলল ন্যাড়া–কিন্তু বাসি মুখে কি মানাবে এ গল্প?

ঠিক কইছস। অই ছোটলু, কিছু খাওন-দাওনের ব্যবস্থা কর। মেহমানগো অভুক্ত রাখতে নাই।–পিচ্চি তাড়া দেয় আমাকে।

আমি মায়ের কাছে আব্দার করতেই চটজলদি চলে আসে চানাচুর আর অরেঞ্জ স্কোয়াশ।

মেহমানদারি করার ইচ্ছে আমার বিন্দুমাত্র ছিল না। তবে ন্যাড়া হচ্ছে 'গে আমার গল্পের প্লটের অন্যতম জোগানদার। বলতে গেলে, গল্পের মস্ত এক দোকান রয়েছে ওর। বিল্টু মামা বাদে ন্যাড়াই আমার গল্পের দ্বিতীয় উৎস। ওর গল্পের ভাণ্ডারের তুলনা হয় না। এ ব্যাপারে ও অদ্বিতীয় বলতে গেলে। ওকে খেপিয়ে লাভ আছে?

পিচ্চি চানাচুরের টক টক দানাগুলো বেছে বেছে খেতে লাগল।

ন্যাড়া স্কোয়াশের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলল, সে অনেকদিন আগের ব্যাপার। বছর কুড়ি-বাইশ তো হবেই। বটুক চাচা তখন সবেমাত্র পাস-টাস করে ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছে।

বেকার হলে মানুষ যা যা করে থাকে, বটুক চাচা তাই করতে শুরু করল। সিগারেট ধরল প্রথমে। তারপর রেস্টুরেন্টে আড্ডা। শেষে সিনেমার বাতিকে পেল।

মুস্কিল হতো সিগারেট খাওয়ার বেলায়। বাড়িতে সিগারেট যাওয়ার জো নেই। সিগারেটে একটা টান দিতে হলে সটান চলে যেতে হতো গুলিস্তানে। তারপর স্টেডিয়ামে নয়তো কামানটার আশেপাশে গোটা চারেক সিগারেট ফুঁকে বাড়ি ফিরতে হতো। ফেরার পথে আবার চুইংগাম চিবুতে হতো, নইলে মুখে সিগারেটের গন্ধ টের পেয়ে যাবার ভয়।

তো একদিন হয়েছে কি, বটুক চাচা রাতের খাবারের পর সিগারেটে সুখটান দেবে বলে গুলিস্তানে গেছে। পল্টনের মাঠে, এখন যেটা আউটার স্টেডিয়াম, ঘাসের ওপর বসে বসে গোটা তিন সিগারেট শেষ করতে না করতেই রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল।

বটুক চাচার মাথায় তখন কত রাজ্যের চিন্তা! আর কতদিন এই বেকার জীবন–এমনি এমনি করেই কি দিন কাটাবো–খামোখাই কেমিস্ট্রি পড়তে গেলাম ইউনিভার্সিটিতে–এইসব।

ন্যাড়াকে এবার থামিয়ে দ্যায় পিচ্চি। বলে, মিস্তিরিগিরি শিখনের লাইগা ইন্‌ভার্সিটিতে যাইতে অয় নাকি?

ন্যাড়া বলল, প্রায় হাফ-ছাগলের মতন বললি কথাটা। মিস্তিরি বটে তবে কাঠের নয়–রসের। তাই না বাংলায় এ বিদ্যার নাম রসায়ন!

ও! রসায়ন পইড়া রসগোল্লা-রসমালাই-রসকদম বানানোর নিয়ম-টিয়ম শিখন যায় বুঝি?–পিচ্চির কাছে কেমিস্ট্রির ব্যাপারটি তথাপি মিস্টিরিয়াস থেকে যায়।

তুই একটা হাফ-আরশোলাও বটে। –ন্যাড়া বলল।–আরে বাবা, রসায়নের কারবার সালফিউরিক এসিড, হাইড্রোজেন গ্যাস, এ্যাটম – এইসব নিয়ে। ও তুই বুঝবি না।

পিচ্চি তড়াক লাফিয়ে ওঠে।–কী সাংঘাতিক! তর চাচায় এ্যাটম বোমা বানাইত?

ন্যাড়া লাল-লাল চোখে পিচ্চিকে ঝলসে দিয়ে গল্পের কাছে ফিরে যায়।

বলে–

বটুক চাচা বাড়িতে ফিরবে বলে উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে হাঁটতে জিপিওর মোড় অব্দি এসে দেখে, সেকি! রাস্তা-ঘাট যে একেবারেই ফাঁকা! না কোনো মানুষজন, না কোনো গাড়ি ঘোড়া। কী ব্যাপার! মাত্তর তো রাত সাড়ে দশটা। এরই মধ্যে গোটা শহর ঘুমিয়ে পড়ল?

না। একা নয় বটে বটুক চাচা। ঘাড় ঘোরাতেই নজরে এলো এক বিদেশি। চাচার পেছন পেছন হাঁটছে। রাস্তা আর আকাশের আলোতে বোঝা গেল, বিদেশির নিবাস হয় জাপান, নয়তো চীন।

বটুক চাচা নিজেকেই শোনায় তার বিড়ম্বনার কথা– এ যে ভারি মুশকিলে পড়া গেল দেখছি!

স্পষ্ট বাংলায় বলে ওঠে সেই বিদেশি, মনে হচ্ছে বিপদে পড়েছেন আপনি?

একটু নয়, অবস্থা স্বাভাবিক হলে যথেষ্ট পরিমাণে অবাক হতো বইকি বটুক চাচা! বিদেশির কণ্ঠে– বিশেষ করে থ্যাবড়া-মুখো বিদেশির কণ্ঠে নির্জলা বাংলা– ভাবা যায় না। কিন্তু বিদেশির উৎকণ্ঠা ভাষান্তরিত হলে কী হবে, স্বদেশি চাচাকে ভাবান্তরিত হতে দেখা গেল না একরত্তিও। তা ওই অবস্থার বিপাকে পড়েই।

বিপদ বলে বিপদ! গাড়ি-ঘোড়ার কোনো লক্ষণই তো দেখছি না। এখন কেমন করে বাড়ি ফিরি? যেতে হবে তো সেই খিলগাঁ! – বটুক চাচা বলে।

খিলগাঁ–সে তো ঘরের কাছেই, ভিন-গাঁ তো নয়! খাল-বিল-নদী-নালা তো পেরুতে হচ্ছে না!

বলছেন ঘরের কাছে? দূরত্ব সম্পর্কে আপনার ধারণা দেখছি একেবারেই নেই।

আছে স্যার, আছে। দূরত্ব সম্পর্কে জ্ঞান আমার যেমন স্বচ্ছ, আপনার বিপদের গুরুত্বটাও আমি দিব্যি চোখে দেখতে পাচ্ছি।

সে কী রকম?

এই যে, শহরে প্রচুর গোলযোগ। কার্ফু লেগে গেছে। টহল পুলিশ যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি একাকী হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন। দেখতে পেয়ে যেকোনো সময় আপনাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে জেলের ভেতর পুরে রাখতে এরা এতটুকু বিচলিত বোধ করবে না–এই সব আর কি!

তাই নাকি? তাই নাকি? তাই নাকি?–বটুক চাচা একই প্রশ্ন উচ্চারণ করে গেল। মানুষ হকচকিয়ে গেলে যা করে থাকে আরকি!

হ্যাঁ। ঐ। ঐ।– ভিনদেশি রসিক বটুক চাচার প্রশ্নের উত্তর সাজিয়ে দেয়।

কী মুশকিল! কী মুশকিল! কী মুশকিল!– বটুক চাচার স্বগতোক্তির অতিশয়োক্তি।

কোনো ভাবনা নেই স্যার। আপনি চাইলেই খিলগাঁ থেকে পল্টনের দূরত্বটা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি। যদি অনুমতি দেন সেবা করার।

তা কী করে সম্ভব?

সবুর করুন। সবুরে মেওয়া ছাড়াও আরও হরেক কিসিমের ফল ফলে বইকি!

আমার ফলের দরকার নেই। এ মুহূর্তে একটা যেনতেন যানবাহন পেলে জানে বেঁচে যাই।

তাহলে চুপচাপ ওই লেটার বক্সের পাশে দাঁড়িয়ে থাকুন। সেটাই বেটার হবে আপনার জন্যে আপাতত।

একটা প্রমাণ সাইজের ডাক-বাক্সের পাশে চাচাকে দাঁড় করিয়ে রেখে থ্যাবড়ামুখো ভিনদেশি রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মিনিট খানেকের মধ্যে দেখা গেল, টহল পুলিশের একটা গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে আব্দুল গনি রোড ধরে গজর গজর করতে করতে স্টেডিয়ামের দিকেই আসছে।

রাস্তার মাঝখানে ভিনদেশিকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল গাড়িটা।

একজন পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে বলে ওঠে, এই কার্ফুর মধ্যে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছ যে? কী মতলব? হাত তুলে দাঁড়াও!

ভিনদেশি খিলখিলিয়ে ওঠে– হাত তুলে দাঁড়াব? শুধু হাত দুটো? আর কিছু না তো? তো, হাত তোলা এমন কী আর কষ্টের? চাই কি খুলেও ফেলতে পারি, যদি অনুমতি দেন। এই... এইরকম করে! – এই না বলে, ভিনদেশি ওর শরীর থেকে হাত দুটো পটাং পটাং করে খুলে ফেলে পায়ের কাছে রাখল। তারপর বলল, দেখলেন তো? কেমন এক হাতের বদলে দু'হাত দেখিয়ে দিলাম? তারপর যদি আপনাদের খায়েশ হয়–যদি ফরমায়েশ করেন– তো মাথাটারও একটা হিল্লে করে দিতে পারি।–এই বলে ভিনদেশি ওর মাথাটা কেমন করে যেন শরীর থেকে আলাদা করে এনে, গাড়ির বনেটের ওপর আলতো করে রাখে।

ভিনদেশি এবার গাড়ির বনেট থেকেই আওয়াজ ছাড়ে।– পা দুটোও বা বাকি থাকে কেন? এই দুটোও কায়দা জানে দু'চারটে। বলতে গেলে যে কাউকে বেকায়দায় ফেলতে হলে আমার পা-জোড়ার জুড়ি মেলা ভার।– বলতে না বলতেই, ভিনদেশির পা-দুটো হাঁটু থেকে খসে এসে আপনা আপনি হাঁটা-হাঁটি করতে থাকে।

ভিনদেশির যাবতীয় শারীরিক কসরত দেখে-টেখে টহল পুলিশেরা যে যেদিকে পারল কেটে পড়ল।

ডাক-বাক্সের আড়াল থেকে বটুক চাচা বেরিয়ে এসে ভিনদেশিকে বলল, এসবের মানে কি, অ্যাঁ, বলি, এসবের মানে কি? তুমি যে আস্ত একটা ভূত সেটি আগে বলনি কেন?

বনেটের ওপর পড়ে থাকা মাথাটি বলে ওঠে, আস্ত আর দেখলেন কোথায় স্যার? আহ্লাদের আটখানার অর্ধেক হয়ে আছি, দেখতেই তো পাচ্ছেন।

মশকরা ছাড়। আগে বল, এসবের মানে কী?

হাত পা মাথা স্ব স্ব জায়গায় বহাল করে অশরীরী বলে, আগে গাড়িতে উঠুন। বাড়ি যেতে হবে না? নাহয় বাড়ি গিয়েই শুনবেন সব কথা!

গাড়িতে উঠে কোন ঘোড়ার ডিম হবে? গাড়ি চালাতে জানলে তো!

ওটা কোনো সমস্যা হলো? নিন উঠে পড়ুন।

বটুক চাচা পুলিশের গাড়িতে উঠল। অশরীরী গাড়ি চালাতে লাগল।

পথে কোনো অসুবিধে হয় নি। তবে রাজারবাগের কাছে আসতেই ভিন্ন এক টহল পুলিশের গাড়ির চালক জিজ্ঞেস করেছিল, কী হে, কোনো খবর টবর আছে নাকি? সব ঠিকঠাক তো?– তারপর গাড়ির চালকের আসনে কাউকে দেখতে না পেয়ে বেচারা প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও পরে এই ভেবে সামলে নিয়েছিল যে সরকার পুলিশদের জন্যে

নতুন এক ধরনের গাড়ি আমদানি করেছেন যেটা চালাতে কোনো ড্রাইভারের প্রয়োজন পড়ে না।

বাড়ি যেতে যেতে অশরীরী ওর বৃত্তান্ত পেশ করে।

নাম ফ্যাচাঙ ফু। বাড়ি চীন দেশে। অনেক দিন আগে–তা প্রায় শ'চারেক বছর তো হবেই– সিচুয়ান প্রদেশের এক মহারাজার বাড়িতে চাকরি করত। চাকরি মানে রান্না-বান্না করা আর কি। তো একদিন চিকেন চাউমিনে লবণ কম হয়েছিল বলে ফ্যাচাঙ ফু-র চাকরি গেল। চাকরির সাথে সাথে গেল নাদুস-নুদুস শরীরটাও। মহারাজার দুয়োরানী আদপে ছিল এক ডাইনি। তো, চাউমিনে লবণের ঘাটতি তার পছন্দ হয়নি। ওই ডাইনিং রুমেই– ডাইনি বলেই কিনা জানা নেই– কী এক মন্ত্রবলে ফ্যাচাঙ ফু-কে অশরীরী বানিয়ে দিয়েছিল। এক ফুৎকারে ফুরিয়ে গিয়েছিল ফ্যাচাঙ ফু-র ফুরফুরে দেহসর্বস্ব জীবন। তবে দুয়োরানী বলতে ছাড়েনি– যেদিন তুই কারো ভালো করতে পারবি– জুটিয়ে দিতে পারবি কোনো সম্মান-খ্যাতি–সেদিনই তুই তোর দেহটাকে ফিরে পাবি। তার আগে নয়। ...বল কী হে, ডাইনিদের আবার ভালো-মন্দের বিচার আছে নাকি?– সব শুনে বটুক চাচা বলে – এ তো অন্যরকম ডাইনির গল্প শোনালে আমাকে! মন্দের ভালো – যা হোক।

ভালো আর দেখলেন কোথায় স্যার? জেনেশুনেই অমন অভিশাপ আমায় দিয়েছে, বুঝলেন কিনা! নইলে গত চারশ বছরেও কোনো হিল্লে হলো না আমার, সে কি এমনি এমনিই?

তার মানে?

মানে আবার কি? মানুষের ভালো আর করব কখন? যে-ই আমাকে দেখে –যখনই আমি দেখা দিই – তখনই হয় সে লোক খাবি খেতে খেতে মূর্ছা যায়, নয়তো চোঁ-চাঁ দৌড় মারে। কারু ধারে– কাছে ঘেঁষতে পারি না। এমনি চলছে গত চারশ বছর ধরে। পৃথিবীর চেহারা পাল্টালো– পাল্টে গেল কত কিছু– দেখলাম কত যুদ্ধ, কত বিপ্লব– কিন্তু মানুষের স্বভাব আর পাল্টাল না। ভূতকে মানুষ চারশ বছর আগে যেমন ভয় পেত– এখনও তেমনি ভয় পায়। দুঃখটা কি আমার কম!– ফ্যাচাঙ ফু কাঁদতে লাগল!

বটুক চাচা একটু অবাক হয়ে গেল। জীবনে কোনো ভূতকে কাঁদতে দেখেনি বটুক চাচা। বলে ভূতই দেখেনি কোনোদিন, তায় আবার ভূতের কান্নাকাটি!

তার মানে বলতে চাইছ, যে তোমার গত চারশ বছরের অভিজ্ঞতার আমিই একমাত্র ব্যতিক্রম?